যখন শূন্য ছিল না

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

একজন আধুনিক মানুষ শূন্যবিহীন জীবনের কথা ভাবতেও পারেন না। ঠিক যেমনি ৭ বা ৩ সংখ্যাগুলো ছাড়া জীবন চলা অসম্ভব। কিন্তু এক সময় শূন্য বলতে কোনো সংখ্যা ছিল না। ঠিক যেভাবে ছিল না ৭ বা ৩১। সেটা প্রাগৈতিহাসিক কালের কথা। তাই জীবাশ্মবিদরা পাথর ও হাড়ের টুকরো থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গণিতের জন্মকাহিনি বের করেছেন। এসব থেকে গবেষকরা জেনেছেন, প্রস্তর যুগের গণিতবিদরা এখনকার গণিতবিদদের চেয়ে অমার্জিত ছিলেন। ব্ল্যাকবোর্ডের বদলে তারা ব্যবহার করতেন নেকড়ের গায়ের বিভিন্ন অংশ।

১৯৩০ এর দশকে প্রস্তর যুগের গণিতবিদদের সম্পর্কে বড় একটি তথ্য মেলে। প্রত্নতত্ত্ববিদ কার্ল আব্লোসম চেকোস্লোভাকিয়ার মাটি নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তিনি এ সময় ৩০ হাজার বছরের পুরনো একটি নেকড়ের হাড় খুঁজে পান। তাতে রয়েছে অনেকগুলো খাঁজ কাটা। কেউ জানে না, গুহামানব গগ এই হাড় দিয়ে তার শিকার করা হরিণ, আঁকা ছবি বা তার গোসল না করা দিনগুলো গুনেছিল কি না। তবে এটা নিশ্চিত, প্রাচীন মানুষেরা কিছু না কিছু গুনেছিল।

প্রস্তর যুগে নেকড়ের একটি হাড়ই বর্তমান সময়ের একটি সুপারকম্পিউটার। গগের আদিপুরুষরা তো দুই পর্যন্তুও গুণতে পারত না। সেখানে শূন্যের দরকার হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। মনে হচ্ছে গণিতের একেবারে শুরুর দিকে মানুষ শুধু এক ও বহুর পার্থক্য বুঝত। একজন গুহামানবের বর্শা হয় একটা থাকত, নাহয় বহু। তিনি একটি টিকটিকি খেতেন, বা বহু। এক বা বহু ছাড়া অন্য রাশিকে বোঝানোর মতো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। ধীরে ধীরে প্রাচীন ভাষাগুলো বিকশিত হলো। এক, দুই ও বহুর মধ্যে পার্থক্য পাওয়া গেল। শেষ পর্যন্ত এক, দুই, তিন ও বহুর পার্থক্যও জানা গেল। কিন্তু আরও বড় সংখ্যার কোনো নাম ছিল না। এই সমস্যা এখনও কিছু কিছু ভাষায় দেখা যায়। বলিভিয়ার সিরিয়না ইন্ডিয়ান বা ব্রাজিলের ইয়ানোয়ামাদের কথাই ধরো। তাদের ভাষায় তিনের বেশি সংখ্যাকে প্রকাশ করার জন্য নেই কোনো শব্দ। তেমন দরকার হলে তারা বলেন “অনেক” বা “প্রচুর।”

কিন্তু সংখ্যার একটি দারুণ বৈশিষ্ট্যের কারণে সংখ্যাপদ্ধতি সেখানেই থেমে যায়নি। সংখ্যাদেরকে যোগ করে নতুন নতুন সংখ্যা পাওয়া যায়। তাই কিছুদিন পরেই বুদ্ধিমান মানুষরা সংখ্যা-শব্দগুলোকে বিভিন্ন সারিতে সাজাতে লাগল। বর্তমান ব্রাজিলের বাকাইরি ও বোরোরো জাতির মানুষের ব্যবহৃত ভাষায় এই কাজটি করা হয়েছে। তাদের সংখ্যাগুলো এ রকম: এক, দুই, দুই ও এক, দুই ও দুই, দুই ও দুই এবং এক ইত্যাদি। তারা দুইয়ের মাধ্যমে হিসাব করে। গণিতবিদরা একে বলেন বাইনারি বা দ্বিমিক পদ্ধতি।

বাকাইরি বা বোরোরোদের মতো করে তেমন কেউ গণনা করেন না। প্রাচীন নেকড়ের হাড়ই প্রাচীনকালের গণনাপদ্ধতির আদর্শ উদাহরণ। গগের নেকড়ের হাড়ে ৫৫টি খাঁজ ছিল। প্রতি গ্রুপে ছিল ৫টি করে খাঁজ। প্রথম ২৫টি দাগের পরে দ্বিতীয় আরও একটি খাঁজ ছিল। মনে হচ্ছে, গগ হয়ত ৫ দিয়ে হিসাব করছিলেন। এবং গ্রুপগুলোকে ৫ দিয়ে গুচ্ছবদ্ধ করছিলেন। এটা করা খুবই অর্থবহ। দাগগুলোকে একটি একটি করে গণনা করার চেয়ে গ্রুপে গ্রুপে সাজিয়ে নিলে অনেক দ্রুত কাজ করা যায়। আধুনিক গণিতবিদরা বলবেন খোদাই শিল্পী গগ পাঁচভিত্তিক (quinary) গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন।

কিন্তু কেন পাঁচ-ই? গভীরে গিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যাবে আসলে যেকোনো একটি সংখ্যা নিলেই চলত। গগ চারটি নিয়ে গুচ্ছ করে দাগ টানলে এবং চার ও ষোলো এর গুচ্ছ বানালেও তার সংখ্যাপদ্ধতি ঠিকই কাজ করত। একইভাবে কাজ করত ছয় ও ছত্রিশের গুচ্ছও। কয়টা নিয়ে গুচ্ছ করা হলো সেটার ওপর হাড়ের ওপর দাগের সংখ্যা নির্ভর করে না। কিন্তু গগ চারের বদলে ৫টি নিয়ে গুচ্ছ করেছেন। পৃথিবীর সব মানুষই গগের বৈশিষ্ট্যটা পেয়েছে। মানুষের প্রতি হাতে পাঁচটি করে আঙ্গুল আছে। ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির সংখ্যাপদ্ধতির ভিত্তি হিসেবে ৫কে জনপ্রিয় হতে দেখা গেল। যেমন, প্রাথমিক যুগের গ্রিকরা ট্যালি চিহ্ন আঁকাকে বলত “ফাইভিং।”

এমনকি দক্ষিণ আমেরিকার দ্বিমিক গণনা পদ্ধতিতেও ভাষাবিদরা পাঁচ ভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতির সূচনা দেখেছেন। বোরোরো ভাষায় “দুই ও দুই এবং এক” বলার আরেকটি উপায় হলো “এটা হলো আমার এই পুরো হাতের সমান।” বোঝাই যাচ্ছে, প্রাচীন আমলের মানুষ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে গণনা করতে চাইত। পাঁচ (এক হাত), দশ (উভয় হাত) এবং বিশ (উভয় হাত ও উভয় পা) ছিল খুব পছন্দনীয় চিহ্ন। ইংরেজি ভাষার ইলেভেন (এগারো) ও টুয়েলভ (বারো) শব্দ দুটি সম্ভবত “ওয়ান ওভার টেন” ও “টু ওভার টেন” থেকে এসেছে। আর তের (থার্টিন), চৌদ্দ (ফোর্টিন), পনের (ফিফটিন) ইত্যাদি হলো যথাক্রমে “থ্রি অ্যান্ড টেন”, “ফোর অ্যান্ড টেন” এবং “ফাইভ অ্যান্ড টেন” এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এ কারণে ভাষাবিদরা মনে করছেন, যে জার্মানীয় আদিভাষাসমূহ থেকে ইংরেজি ভাষা এসেছে সেগুলোতে দশ ছিল মৌলিক একক। এ কারণে সেই ভাষাগুলোর মানুষরাও ১০-ভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতি ব্যবহার করতেন। অন্য দিকে ফরাসি ভাষায় আশিকে বলে কোয়াত্রে ভিংত (চারটি বিশ)। আর নব্বইকে বলে কোয়াত্রে ভিংত দি (চারটি বিশ ও একটি দশ)। হয়ত এখনকার ফ্রান্সে যে মানুষগুলো বাস করতেন তারা ২০-ভিত্তিক বা ভিজেসিনাল সংখ্যাপদ্ধতি ব্যবহার করতেন। সাত ও ৩১-এর মতো সংখ্যাগুলো এই সবগুলো সংখ্যাপদ্ধতিতেই ছিল। হোক সেটা ৫-ভিত্তিক, ১০-ভিত্তিক, কিংবা ২০-ভিত্তিক। কিন্তু এগুলোর কোনোটিতেই ছিল না শূন্যের জন্যে কোনো নাম। এই ধারণাটারই অস্তিত্ব ছিল না।

শূন্যটি ভেড়ার যত্ন তো কখনও নিতে হয় না। কিংবা শুন্যসংখ্যক সন্তানের হিসাব রাখার দরকার হয় না। “আমার কাছে শূন্যটি কলা আছে” না বলে দোকানী বলেন, “আমার কাছে কোনো কলা নেই।” কোনো কিছুর অভাব বোঝানোর জন্যে সংখ্যার প্রয়োজন হয় না। আর কোনো বস্তুর অভাবকে প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করার বিষয়টিও কারও মাথায় আসেনি। এ কারণেই শূন্য ছাড়াই মানুষ এতগুলো সময় পার করে দিয়েছে। শূন্যের দরকারই পড়েনি। শূন্যের উদয় তাই ঘটেনি।

সত্যি বলতে, প্রাগৈতিহাসিক কালে সংখ্যার জ্ঞান ছিল বড় এক গুণ। গুনতে পারা ছিল দারুণ মেধার পরিচায়ক। একে জাদুমন্ত্রের মতোই অতীন্দ্রিয় ও গুপ্ত মনে করা হত। মিশরীয় বই বুক অব ডেড-এ আকেন নামে এক নৌকার মাঝি বিদেহী আত্মাকে নদী পার করে নরকে পৌঁছে দেয়। তিনি একবার একটি মৃত আত্মার মুখোমুখি হন। এ সময় তিনি “তার আঙ্গুলের সংখ্যা জানে না” এমন কাউকে নৌকায় নিতে অস্বীকার করেন। মাঝিকে সন্তুষ্ট করতে তখন আত্মাকে আঙ্গুলের সংখ্যা বের করতে একটি গণনার ছড়া আওড়াতে হয়। (অবশ্য গ্রিক গল্পে মাঝি চাইত টাকা, যা মৃত ব্যক্তির জিহ্বার নিচে বাঁধা থাকত)।

প্রাচীন পৃথিবীতে গুনতে পারত হাতে গোনা কিছু মানুষ। তবে সংখ্যা ও গণনার মৌলিক ধারণাগুলো সবসময় মানুষ আয়ত্ত করে লিখতে-পড়তে পারার আগেই। আগেকার যুগের সভ্যতার মানুষ যখন খাগড়া দিয়ে মাটির লিপিতে লিখতে, পাথরে খোদাই করে ছবি আঁকতে ও পশুচর্ম ও প্যাপাইরাসে কালি দিয়ে লিখতে শুরু করে, তত দিনে সংখ্যাপদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। মৌখিক সংখ্যাপদ্ধতিকে লিখিত আকারে উপস্থাপন করা খুবই সহজ কাজ ছিল। দরকার শুধু একটি সাঙ্কেতিক পদ্ধতি। যার মাধ্যমে লেখকরা সংখ্যাকে আরও স্থায়ী রূপ দিতে পারে। (কিছু কিছু সমাজের মানুষ তো লেখালেখি শেখার আগেই এই কাজটি করে ফেলেছে। যেমন নিরক্ষর ইনকারা কুইপু নামে একটি পদ্ধতি ব্যবহার করত। এটা ছিল হিসাব করার জন্য বানানো একটি রঙিন ও গিঁট বাঁধা দড়ি।)

প্রথমদিকের লেখকদের লেখা সংখ্যাগুলোর সাথে তাদের সংখ্যাপদ্ধতির মিল থাকত। আর অনুমিতভাবেই তারা সেটা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত উপায়ে লিখত। গগের সময়ের পরে সমাজ জীবনে উন্নতি সাধিত হয়েছে। একের পর এক ছোট ছোট দাগের গুচ্ছ না বানিয়ে লেখকরা প্রতিটি গুচ্ছের জন্যে প্রতীক তৈরি করল। পাঁচ-ভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতিতে লেখক এক লেখার জন্যে হয়ত একটি দাগ দেবেন। পাঁচ এর একটি গুচ্ছ বোঝাতে আলাদা আরেকটি চিহ্ন ব্যবহার করবেন। ২৫ এর গুচ্ছ বোঝাতে ব্যবহার করবেন অন্য আরেকটি দাগ। এভাবেই চলবে।

মিশরীয়রা ঠিক এই কাজটিই করেছে। ৫ হাজার বছরেরও আগে, পিরামিডও তৈরির আগেই মিশরীয়রা তাদের দশমিক পদ্ধতিকে লেখায় রূপ দেওয়ার একটি নিয়ম তৈরি করে। সেখানে তারা ছবি দিয়ে সংখ্যা বোঝাত। একটি খাড়া দাগ দিয়ে এক একক বোঝানো হত। আবার গোড়ালির একটি হাড় দিয়ে বোঝানো হত ১০, একটি মোচড়ানো দড়ি ছিল ১০০ ইত্যাদি। এভাবে সংখ্যা লিখে যাওয়ার জন্যে তাদেরকে শুধু এই প্রতীকগুলোর গুচ্ছ রেকর্ড করতে হত। এক শ তেইশ বোঝানোর জন্যে ১২৩টি দাগ দেওয়ার বদলে লেখকরা ছয়টি প্রতীক লিখত। একটি রশি, দুটি গোড়ালি ও তিনটি খাড়া দাগ। প্রাচীনকালেই মূলত এভাবেই গাণিতিক কাজ হত। আর অন্য অনেক সভ্যতার মতোই মিশরেও শূন্য ছিল না। বা বলা যায়, প্রয়োজন হয়নি।

তবুও প্রাচীন মিশরীয়রা গণিতে ভালোই হাত পাকিয়েছিল। জ্যোতির্বিদ্যা ও সময় গণনায় তারা কারিশমা দেখিয়েছিল। তার মানে তাদেরকে উন্নত গণিত ব্যবহার করতে হয়েছিল। কারণ পঞ্জিকার পাতা খুব দ্রুত বদলে যায়।

বেশিরভাগ প্রাচীন মানুষের কাছেই একটি স্থিতিশীল পঞ্জিকা বানানো ছিল বড় এক সমস্যার কাজ। এর কারণ ছিল তারা সাধারণত চান্দ্র পঞ্জিকা দিয়ে কাজ শুরু করতেন। পরপর দুটি পূর্ণিমার মাঝের সময়টুকু ছিল এক মাস। এভাবে গণনা করাই ছিল সহজাত অভ্যাস। আকাশে চাঁদের বড়-ছোট হওয়া থেকে চোখ সরিয়ে রাখা ছিল কঠিন। আর সময়ের চক্র হিসাব করার জন্যে এ থেকে সুবিধাজনক একটি উপায়ও খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু চান্দ্র মাসের দৈর্ঘ্য হয় ২৯ থেকে ৩০ দিনের মাঝামাঝি। ১২টি মাস যোগ করে সব মিলিয়ে ৩৫৪ দিনের বেশি পাওয়া যায় না। যা সৌর বছরের চেয়ে ১১ দিন ছোট। তেরটি চান্দ্র মাস নিলে আবার ১৯ দিন বেশি হয়ে যায়। ওদিকে আবার চাষাবাদ নির্ভর করে সৌর বছরের ওপর, চান্দ্র বছর নয়। অসংশোধিত চান্দ্র মাস দিয়ে হিসাব করলে ঋতুর মাসগুলোকে বদলে যেতে দেখা যায়।

চান্দ্র মাসকে সংশোধন করাও আরেক মুশকিলের কাজ। সৌদি আরব ও ইসরায়েলসহ অনেকগুলো আধুনিক কালের দেশ এখনও পরিমার্জিত চান্দ্র পঞ্জিকা ব্যবহার করে। কিন্তু ৬ হাজার বছর আগে মিশরীয়রা আরও ভাল একটি সমাধান পেয়ে যায়। দিনের হিসাব রাখার তাদের পদ্ধতিটি ছিল অনেক সরল। সেই পঞ্জিকা ঋতুর সাথে মিল রেখে চলত অনেক দিন পর্যন্ত। সময়ের হিসাব রাখতে তারা চাঁদের বদলে সূর্যের ধারস্থ হয়। যেমনটা বর্তমানে বেশিরভাগ জাতি করেন।

চান্দ্র পঞ্জিকার মতোই তাদের মাস ছিল ১২টি। কিন্তু প্রতিটি মাস ছিল ৩০ দিনের। (১০-ভিত্তিক সংখ্যা ব্যবহার করায় তাদের এক সপ্তাহের দৈর্ঘ্য ছিল ১০ দিন। বছর শেষ হলে আরও বাড়তি পাঁচটি দিন যোগ করা হত। এতে করে সব মিলিয়ে ৩৬৫ দিন হয়ে যেত। এই পঞ্জিকাই আমাদের বর্তমান ক্যালেন্ডারের আদিরূপ। মিশরীয়দের এই পদ্ধতি গ্রিক ও পরে রোমানরা গ্রহণ করে। রোমানরা একে পরিমার্জন করে অধিবর্ষ যোগ করে। এটাই পরে পাশ্চাত্যে আদর্শ পঞ্জিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে মিশরীয়, গ্রিক ও রোমানদের কাছে শূন্যের ব্যবহার না থাকায় পশ্চিমা পঞ্জিকায়ও নেই শূন্য। এই অমনোযগই সহস্র বছর পরে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মিশরীয়দের সৌর পঞ্জিকার উদ্ভাবন ছিল দারুণ এক অগ্রগতি। তবে ইতিহাসের পাতায় তারা আরও গুরত্বপূর্ণ একটি অবদানের স্বাক্ষরও রাখে। জ্যামিতির জ্ঞান। শূন্য ছাড়াই মিশরীয় অল্প সময়ের মধ্যেই গণিতের বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে। পাশেই একটি উত্তাল নদীর উপস্থিতিতে আসলে না হয়েও উপায় ছিল না। প্রতি বছর নীল নদের পানি উপচে পড়ে এর কূল ভাসিয়ে দিত। বদ্বীপে নেমে আসত বন্যা। একটি ভাল দিকও ছিল এর। উন্নত পলি এসে জমত কৃষি জমিতে। এর ফলে প্রাচীন পৃথিবীতে নীল বদ্বীপ হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে উর্বর কৃষিজমি। খারাপ দিকের মধ্যে ছিল সীমানার দাগ হারিয়ে যাওয়া। কৃষকরা বুঝতে পারতেন না কোনটা কার আবাদি জমি। মিশরে মালিকানাকে খুব গুরত্ব দেওয়া হত। মিশরীয় বই বুক অব ডেড পড়লে দেখা যায়, একজন মৃত মানুষকে ঈশ্বরের কাছে শপথ করে বলতে হয় যে সে প্রতারণা করে তার প্রতিবেশীর জমি দখল করেনি। এই পাপের শাস্তি ছিল এক ভয়ানক ভক্ষক প্রাণীকে পাপীর হৃদপিণ্ড খেতে দেওয়া। মিশরে চুরি করা ছিল শপথ ভাঙা, কাউকে হত্যা করা বা মন্দিরে স্বমৈথুনের মতোই কঠিন অপরাধ।

প্রাচীন ফেরাউনরা ক্ষয়ক্ষতি পরিমাপ ও নতুন করে সীমানা নির্দেশক স্থাপন করার জন্য জরিপ-আমিন নিয়োগ দিত। আর এভাবেই জন্ম জ্যামিতির। এই জরিপ-আমিন বা দড়ি প্রসারকরা (এটা বলা হত কারণ তারা পরিমাপের যন্ত্র ও গিঁট বাঁধা রশি দিয়ে সমকোণ বানাত) শেষ পর্যন্ত জমিকে আয়তক্ষেত্র ও ত্রিভুজে বিভক্ত করে ক্ষেত্রফল বের করার কায়দা বের করে। এছাড়া মিশরীয়রা পিরামিডের মতো বিভিন্ন বস্তুর আয়তন মাপার কৌশলও আয়ত্ত করে। পুরো ভূমধ্যসাগর এলাকায় মিশরীয় গণিত খ্যাতি অর্জন করেছিল। এবং সম্ভবত প্রাথমিক যুগের গ্রিক গণিতবিদরা, বিশেষ করে থ্যালিস ও পিথাগোরাসের মতো জ্যামিতিবিদরা মিশরে পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু মিশরীয়দের এতসব দারুণ জ্যামিতিক কর্ম সত্ত্বেও মিশরের কোথাও শূন্যের অস্তিত্ব ছিল না।

এর বড় কারণ, মিশরীয়া ছিল কড়া বাস্তববাদী। আয়তন এবং দিন ও ঘণ্টা পরিমাপের বেশি কিছু তারা করতে পারেনি। প্রয়োগ নেই এমন কোনো কিছুতে গণিত তারা কাজে লাগাত না। এ কারণে মিশরের সেরা গণতিবিদরাও বাস্তব জগতের সাথে অসম্পর্কিত কোনো গাণিতিক সমস্যায় জ্যামিতির মূলনীতিকে কাজে লাগাতে পারতেন না। তারা তাদের গাণিতিক ব্যবস্থাকে বিমূর্ত যুক্তির কাঠামোতে রূপ দিতে পারেনি। গণিতকে দর্শনে স্থান দিতেও তাদের কোনো উদ্যোগ ছিল না। গ্রিকরা আবার এমন ছিল না। বিমূর্ত ও দার্শনিক যুক্তিকে তারা সাদরে গ্রহণ করেছিল। প্রাচীন গণিতকে তারাই সর্বোচ্চ উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। তবুও তারা শূন্য আবিষ্কার করতে পারেনি। শূন্যে এসেছে প্রাচ্য থেকে। পাশ্চাত্য থেকে নয়। ভারতের আবিষ্কার ও আরবের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে শূন্য চলে আসে সংখ্যা ও গণিতের জগতে। সে গল্প বলব আরেকদিন ইনশাআল্লাহ।